ব্রেখটের সিনেমা-জীবন : এক অন্য পাঠ ও আবিষ্কার

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

বের্টোল্ট ব্রেখট থিয়েটারের মানুষ। আরেকটু এগিয়ে বড়জোর ভাবা যেতে পারে ব্রেখট কবি। বিপ্লবী কবি। তিনি কি কমিউনিস্ট? এই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। আর সেই বিতর্ক সময় সময় উসকে দিয়েছেন ব্রেখট নিজেই। আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটি কমিটির মুখোমুখি হয়ে জানান, তিনি কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। এখনও নয়। সময়টা ১৯৪৭। হিটলার জমানায় জার্মানি থেকে পালিয়ে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় থাকেন ব্রেখট। আসলে প্রায় ১২ বছর নিজভূমি জার্মানি ছেড়েছেন তিনি। ডেনমার্ক, নিউ ইয়র্ক হয়ে হলিউড চত্বরে এসেছেন। হলিউড সিনেমা দুনিয়ার সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছেন। তবে হলিউডে যে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন এমন নয়। বরং হলিউড দুনিয়ার প্রতি তিনি একটু বিরক্তই। তার অন্যতম কারণ হলিউডে তিনি ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। তবুও হলিউডের জন্যে চিত্রনাট্য লেখার কাজে নেমে পড়েছেন তিনি। ব্রেখট সিনেমার লোক হয়ে উঠতে চাইছেন। হয়ত হলিউডে টিকে থাকার জন্যেই তিনি আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটি কমিটির সামনে মিথ্যে বললেন, তিনি কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। তাই কি? জার্মানিতে থাকার সময় তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আমেরিকায় এসেও তিনি মার্কিন মুলুকের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আর সেই সূত্রেই তো তাঁর মুখোমুখি দেখা হয় তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পরিচালক চার্লস চ্যাপলিনের সঙ্গে। প্রসঙ্গত চ্যাপলিনকেও আন-আমেরিকান কমিটির জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল। চল্লিশের শুরুতে ব্রেখট যখন কালিফোর্নিয়ায় পৌঁছোলেন তখন তাঁর হাতে টাকা পয়সা নেই। হলিউডের দিকে পা বাড়ালেন তিনি কিছু টাকা রোজগারের আশাতেই। তবে সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ব্রেখটের এই প্রথম নয়। সিনেমা আগ্রহী হয়েছেন তিনি সেই যৌবনকাল থেকেই।

২

আশ্চর্য সমাপতন। ব্রেখটের বয়স আর চলচ্চিত্রের বয়সে মাত্র বছর তিনেকের তফাৎ। ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারিস শহরে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের তৈরি দশটি ছোট ছোট চলচ্চিত্র প্রথমবারের জন্য বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন করেন। আর এর তিন বছর পর ব্রেটোল্ট ব্রেখট জন্মাচ্ছেন জার্মানির আউগসবার্গে ১০ ফেব্রয়ারি ১৮৯৮। যৌবনে পা দিয়েই তিনি আউগসবার্গ থেকে চলে আসছেন মিউনিখে। ফ্রান্সের যেমন প্যারিস, তখন জার্মানির হল মিউনিখ। মূল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যুবক ব্রেখটের চোখে স্বপ্ন কবি ও নাটককার হবার। পাশাপাশি জার্মান সিনেমার নানা বৈচিত্রময়তা এবং হলিউড প্রবণতা তাঁর বিশেষ করে চোখ টানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মান সিনেমায় মূলত দুটো ধারা দেখা যায়। এক

সরাসরি বিনোদনধর্মী, দুই, এক্সপ্রেশনিজম ধারা। যে ধারায় প্রভাবিত হয়ে ব্রেখট লিখে ফেলেছেন তাঁর ‘বাল’ নাটকটি। নাটকের কাজের পাশাপাশি ব্রেখট চলচ্চিত্র নামক প্রায় নবীন মাধ্যমটি সম্পর্কে ক্রমশ যে আগ্রহী হয়ে উঠছেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর তখনকার রোজনামচাতেই। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই ব্রেখট রোজনামচায় লিখলেন, ‘সম্প্রতি অনেকগুলো সিনেমা দেখলাম। প্রায় সবকটিই রহস্য-রোমাঞ্চ ছবি। চলচ্চিত্রের কেতা-কায়দাগুলো বেশ মন টানে।’ বোঝা যাচ্ছে ব্রেখট সিনেমা দেখতে গিয়ে চলচ্চিত্রের টেকনিকের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বাইশ বছরের ব্রেখট ক্রমেই সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহী হচ্ছেন। বুঝতে চাইছেন সিনেমার কলাকৌশলকে। তবে মিউনিখে এসেই যে তিনি প্রথম সিনেমা দেখছেন, এমন নয়। আউগসবার্গেও তাঁর যথেষ্ট সিনেমা অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা ক্রমশ আগ্রহে রূপান্তরিত হল মিউনিখে এসেই। অন্তত সেইরকমই সাক্ষি দিচ্ছে তাঁর রোজনামচা। শুধু সিনেমা দেখা নয় সিনেমা নিয়ে লেখার কথাও ভাবছেন ব্রেখট। ১৯২০ সালের ২৭ জুলাইয়ের পাতায় লেখা, ‘সন্ধেবেলা হেডাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলাম। ছবির লোকেশন সমুদ্রসৈকত। বিদেশি ছবি নকল করে এইরকম চিত্রনাট্য কেন যে লেখা হয়? ভাবছি এবার আমি চিত্রনাট্য লেখার কাজে নামব।’ এর এক বছরের মধ্যেই তিনি ‘মিস্ট্রি অফ জ্যামাইকা বার’ নামে এক চিত্রনাট্য লিখে ফেললেন। এই চিত্রনাট্য নিয়ে লেখার আগে তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে সরজমিনে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তখন তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে কীভাবে দেখছেন তার খানিক হদিশ মেলে সেইসময় লেখা ‘ফিল্ম’ রচনাটির মধ্যে। সেখানে তিনি অবশ্য এক অন্য ভয় পাচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে সিনেমা যদি আরও জনপ্রিয় হতে থাকে তাহলে থিয়েটারের দর্শক ক্রমেই কমতে থাকবে। পরে অবশ্য এই ভাবনা থেকে তিনি সরে আসেন। ‘মিস্ট্রি অফ জ্যামাইকা বার’ প্রসঙ্গও পাই তাঁর ডায়েরি-তে। তিনি ১৯২১ সালের ২৩ মার্চের এন্ট্রিতে লিখছেন, ‘সারাদিনরাত এখন সিনেমার জন্যে চিত্রনাট্য লিখছি। অনেক টাকার দরকার। হেডার মাথার ওপর একটা ছাদ তৈরি করে দিতে হবে। টানা পরিশ্রম। মাঝে মাঝে মনে হয় আর পারছি না। ফিল্মের কাজ ছেড়ে দিই। ‘দ্য সিক্রেট অফ জ্যামাইকা বার’-এর প্রায় ১০০টি শট লেখা হয়ে গেল। তার মানে এই চিত্রনাট্যটা প্রায় মাঝের পথে। আর ‘দ্য অরেঞ্জ ইটার’ তো শেষ। ক্লেট বলেছে প্রথমটার জন্যে স্টুডিও থেকে পাওয়া যাবে দশ হাজার মার্ক। তার মধ্যে আমি পাব ছ হাজার।’

সিনেমার চিত্রনাট্য লেখাটাকে জীবিকা হিসেবেই বেছে নিতে চাইছেন ইউগেন বের্টোল্ট ব্রেখট। এই ২৩ বছর বয়সেই তাঁর জীবনে এসেছে মেরিয়ন নামে নারী। মেরিয়ন অভিনেত্রী। থিয়েটার দেখতে গিয়েই সুন্দরী মেরিয়নের প্রেমে পড়েন ২৩ বছরের ব্রেখট। নাটক থেকে তেমন ভাল রোজগার নেই মেরিয়নের। তাছাড়া তিনি তখন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গেও প্রেমে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু ব্রেখটের সঙ্গেও প্রেমের টানে জড়িয়ে গেলেন। ত্রিকোণ প্রেম। ব্যবসায়ী রিখটের কাছ থেকে মেরিয়নকে সরিয়ে আনতে চান ব্রেখট। মেরিয়নকে নিয়ে সংসার পাততে চান। আর সেই কারণেই চিত্রনাট্য লিখে রোজগার করার আপ্রাণ চেষ্টা। শেষ অবধি অবশ্য মেরিয়নের সঙ্গে বিয়ে হয়নি ব্রেখটের। মেরিয়ন বিয়ে করেছিলেন রিখটকেই। যতই জীবিকার জন্যে সিনেমার কাজ করার চেষ্টা করুন, একদিন স্টুডিওয় ‘সিৎজ’ ছবির সেটে গিয়ে তিনি তো রীতিমত হতাশ, লিখছেন, ‘কী একটা পচা ছবি তৈরি হচ্ছে। পুরোটাই আর্বজনা। আলো আর রঙের আড়ালে মানুষের মুখগুলোই চাপা পড়ে যায়। মনে হয় এইসব ছবির শিকড় রয়ে গেছে রান্নাঘরের বাসনমাজার জায়গায়’। জার্মান সিনেমা দুনিয়া নিয়ে এতটাই বিরক্ত তিনি। কিন্তু এই বিরক্তির মধ্যেই তিনি অর্থ উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নিতে চাইলেন সিনেমাকেই। যেমন ‘সুমুরুন’ নামে একটা ছবি দেখার পর ১৯২০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, ‘সুমুরুন’ ছবিটা দেখলাম। পরিচালনা মন্দ নয়। কিন্তু চিত্রনাট্যটা ভাল নয়, কী রকম বোকা বোকা। হঠাৎ মনে হল সিনেমার চিত্রনাট্য লিখলে কেমন হয়? সারারাত জেগে একটা চিত্রনাট্য লিখেও ফেললাম।’ শুধু রাত

জেগে লেখা এই 'পোপ অফ দ্য মোরমোনস'ই নয়, চিত্রনাট্য লেখাটা প্রায় নেশার মত পেয়ে বসল তাঁকে। একের পর এক চিত্রনাট্য লিখে চলেছেন, তার মধ্যে একটা হল 'পোপ অফ দ্য মোরমোনস।' তবে যে ধরনের বিনোদনধর্মী চিত্রনাট্যের চল ছিল সেইসময় তার থেকে একটু অন্যধরনের বৈচিত্র্য নিয়ে এল ব্রেখটের চিত্রনাট্য। জায়গায় জায়গায় তাঁর এপিক তত্ত্বের প্রভাবও পড়ল। কেননা ব্রেখট তখনই তাঁর এপিক থিয়েটারে চলচ্চিত্রের টুকরো টুকরো ব্যবহারের কথা ভাবছেন। তিনি দেখলেন, 'চলচ্চিত্র হল এক নতুন এবং বিশাল মাধ্যম। যা অভিনীত ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ সাহায্য করে। যার মাধ্যমে একই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যে ঘটনা ঘটছে তা একত্রিত করে দেখানো সম্ভব। এবং ফিল্ম প্রজেকশনের মাধ্যমে ঘটনার জটিল সামাজিক দ্বন্দ্বকে পুরোভাগে এনে দেখানো সম্ভব'। বিনোদনধর্মিতার মধ্যেও এইসব ভাবনাগুলো চলে আসছিল ব্রেখটের চিত্রনাট্যে। বিনোদন থাকা সত্ত্বেও ব্রেখটের এই অন্যধারার চিত্রনাট্য খুব যে বাজার পেল এমন নয়। হাল ছাড়া ইউগেন ব্রেখটের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই নিজেই জানান যে তাঁর মাথায় এখন অনেক ছবির পরিকল্পনা আসছে। ছবি তখন নির্বাক। জার্মানির স্টুডিওতে দু-তিন বা চার রিলের ছোট ছোট ছবি তৈরি হচ্ছে। অবশ্যই ছবিগুলোর মধ্যে একটা কাহিনি কাঠামো থাকছে। এন্টারটেইনমেন্ট যার মূল কথা। এই এন্টারটেইনমেন্টকে একটু অন্য মোড়কে মুড়তে চাইছেন ইউগেন। ব্রেখটের চিত্রনাট্যে ঘুরে ফিরে আসে তার আশেপাশের মানুষেরাই। বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে তার সিনেমার গল্পে। ১৯২১ সালের ফ্রেব্রুয়ারিতে তিনি জানাচ্ছেন, 'গল্পটা একজন মেয়েকে ঘিরে। যে সাভানা প্রান্তরে বড় হয়েও ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে।' এই নারীচরিত্রটা যেন গড়ে ওঠে ব্রেখটের তৎকালীন প্রেমিকা মেরিয়নকে ঘিরেই। এইরকম চেনাজানা অনেক চরিত্রই চলে আসত তাঁর সিনেমা-গল্পে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রেখট সেইসময়কার জার্মানির সিনেমা জগতে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। এমনকি এক চিত্রনাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বাবদ এক লাখ মার্ক পেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সেভাবে গ্রহণ করল না জার্মান সিনেমা। ব্রেখট তো একসময় সিনেমা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন, 'সারাদিন সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার মত পাপ কাজ করে জীবনটা কেটে যাচ্ছে। এর থেকে যে বেরিয়ে আসব সে পথও দেখছি না। সব বুঝেও সিনেমার গল্প লিখে চলেছি।'

৩

সিনেমাকে নিয়ে এই বিরক্তি আজীবন বয়ে চলেছেন ব্রেখট। এমনকী এইসবেরও কুড়ি বছর পর, ১৯৪১ সালে আমেরিকায় গিয়ে হলিউডের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। দু একটা গল্প বিক্রিও হয় তাঁর। কিন্তু হলিউড জায়গাটা একদমই পছন্দ হয় না তাঁর। হাতের কাছে সেই প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যেতেই পারে হলিউড নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো। সেখান থেকে খুবই স্পষ্ট যে হলিউডকে তিনি ভাল চোখে দেখছেন না, তাঁর চোখে হলিউড এক বেচাকেনার বাজার। প্রথম থেকেই ব্রেখট নাটকের মানুষ। কিন্তু মাঝেমধ্যেই জড়িয়েছেন চলচ্চিত্রের সঙ্গে। যেমন ১৯২৮ সালে এলিজাবেথ হাউপ্টম্যান ব্রেখটের জন্যেই জন গ্রে-র 'বেগার অপেরা' জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন। ১৯২৯-তে সেই অনুবাদকে অবলম্বন করে ব্রেখট লিখলেন তার বিখ্যাত নাটক 'থ্রি পেনি অপেরা'। যেখানে তাঁর এপিক থিয়েটার তত্ত্ব সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন। সিনেমায় নিয়ে এলেন এ্যালিনিয়েশন এফেক্ট। এই 'থ্রি পেনি অপেরা'র দারুণ মঞ্চসফলতা দেখে নেরো ফিল্ম কোম্পানি এই নাটকটিকে নিয়ে সিনেমা করার জন্যে ব্রেখটের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। কিন্তু 'থ্রি পেনি অপেরা' সিনেমা হবার পর ব্রেখট দেখলেন তার নাটকটিকে অনেক বদলে ফেলা হয়েছে। তিনি এই জন্যে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করলেন। যদিও সেই মামলা জিততে পারেননি তিনি। তবে ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। এরপর ১৯৩২ সালে আবার বন্ধু ডুডোভের ছবির চিত্রনাট্য লিখলেন। নাম 'কুহলে ভাম্পে'। পরে ফিৎস ল্যাং-এর সঙ্গে ছবি করেন 'হ্যাংম্যান

অলসো ডাই'। এছাড়া সিনেমার সঙ্গে নানাসময়ে জড়িয়েছেন ব্রেখট।

এইসব নিয়েই মার্ক সিলবারম্যান এক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন — 'বের্টোল্ট ব্রেখট অন ফিল্ম অ্যাণ্ড রেডিও।' যার মধ্যে রয়েছে ব্রেখটের সিনেমায় জড়িয়ে পড়ার নানা তথ্য। যেগুলো এক জায়গায় করা খুব সহজ কথা নয়। শুধু জোগাড়ের কাজই করেননি সিলবারম্যান। সেগুলো সব ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মার্ক জানান, 'Few readers of Bertolt Brecht (1898-1956) are familiar with his writings about and for the cinema or radio broadcasting. Even in Germany – where he is one of the most produced dramatists on the contemporary stage and his poems and stories are regularly anthologized in school readers – his work on these media is perceived to have been scattered and intermittent. Similarly – in the English-speaking world Brecht's reputation is based on his contributions as a great dramatist and notable theorist of the theatre. This volume gathers together for the first time in English translation the pertinent writings of a creative artist and trenchant thinker who also turned his attention to new technologies that marked the first half of this century'। সত্যিই তাঁর সিনেমা যোগ নিয়ে ইংরেজি ভাষায় তেমন কোনও কাজ হয়নি। তাই জার্মানির বাইরে ব্রেখট মানে শুধুই নাটককার। বড়জোর কবি। কিন্তু এই গ্রন্থ আমাদের সামনে খুলে দেয় ব্রেখট ভাবনায় এক অন্য দরজা। আমার পেয়ে যাই চলচ্চিত্র ও রেডিও সংক্রান্ত ব্রেখটের নানা লেখা ও ভাবনার হদিশ। দেখা যাক কী কী আছে এই সংকলন গ্রন্থে। প্রথম পর্বে ব্রেখটের সিনেমা নিয়ে নানা লেখার সংকলন — টেক্সট অ্যান্ড ফ্রাগমেন্টস অন দ্য সিনেমা (১৯১৯-১৯৫৫), দ্বিতীয় পর্বে 'টেক্সট অন রেডিও ব্রডকাস্টিং (১৯২৬-১৯৩২)', শিরোনাম দেখেই বোঝা যায় এই পর্বে কী রয়েছে। তৃতীয় পর্বের নাম 'আরলি স্ক্রিনপ্লে'। এখানে টুকরো টুকরো চিত্রনাট্যের সঙ্গে রয়েছে 'দ্য মিস্ট্রি অফ জ্যামাইকা বার'-এর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। যা এতদিন দুষ্প্রাপ্যই ছিল। চতুর্থ পর্ব - 'থ্রি পেনি মেটিরিয়াল'। 'থ্রি পেনি অপেরা' ছবি নিয়ে ব্রেখটের লেখা নানা প্রতিবাদ ও পলিমিক। এবং পঞ্চম পর্বে 'দ্য কুহলে ভ্যাম্পে ফিল্ম'।

লেখক সম্পাদক অনুবাদক মার্ক ভূমিকায় তাঁর বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন, 'If the 'Lawsuit' essay is Brecht's most sophisticated contribution to media theory – then the contemporaneous film project *Kuhle Wampe* is his most important legacy to film history – the only example of his practical work that came close to realizing the idea of de-individualizing (aesthetic) production in the cinema.

V) Not only the film's planning and shooting, but also its themes and structure integrate the collective experience with new ways of representing reality. In a self-conscious attempt to counteract the hierarchical studio arrangements in the commercial industry, Brecht brought together a production team consisting of the Bulgarian emigre Slatan Dudow, novelist Ernst Ottwald and composer Hanns Eisler, as well as well-known actors from the workers' theatre movement and thousands of enthusiasts organized in workers' sports clubs for the film's finale. For Brecht the successful completion of the shooting was a significant public event because it had engaged leading Leftist intellectuals with workers' organizations in a creative process. The entire project was also an exceptional example of how to link questions of representation, social change and the subject who will effect that change – issues that preoccupied Brecht during the early 1930s'.

৪

ফিৎস ল্যাং-এর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল ব্রেখটের। ইতিমধ্যে ফিৎসও জার্মানি ছেড়ে হলিউডে চলে এসেছেন। মার্কিন প্রবাসে এসে ফিৎসের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হল ব্রেখটের। তিনি তখন হলিউডে চিত্রনাট্য লিখে রোজগারের পথ খুঁজছেন। বেশ কয়েকটা চিত্রনাট্য লিখেও ফেলেছেন। ইতিমধ্যে 'দ্য কিংস ব্রেড' নামে একটা চিত্রনাট্য বেশ ভাল দামে বিক্রিও হয়েছে। এই সময়ই তার ল্যাং-এর সঙ্গে যোগাযোগ। বছর পনের আগে জার্মানিতে ফিৎস ল্যাং-এর 'মেট্রোপলিশ' ছবিতে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন ব্রেখট। এবার হলিউডে দুজনে মিলে চিত্রনাট্য লেখার কাজে বসলেন। চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ হলে ছবিটি পরিচালনা করলেন ফিৎস ল্যাং। এই কাজটার জন্যে ব্রেখট প্রায় ৫০০০ ডলার পেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হলিউডে ব্রেখট নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তার ওপর তাঁকে কমিউনিস্ট হিসেবে সন্দেহের তালিকাতেও রাখা হচ্ছিল। ব্রেখট আবার ফিরে এলেন জার্মানিতে। এরপর আবার তিনি মার্কিন দেশে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁকে ভিসা দেয়নি। যাইহোক, কী চোখে দেখলেন তিনি হলিউডকে তা বেশ কিছু কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি লিখেছেন। সেগুলো হল :

অঙ্গরাগ

১/
খুব হিসেব-নিকেশ করেই তৈরি হয়েছে স্বর্গরাজ্য
হলিউড।
অঙ্কটা খুব সহজ, ভগবানের স্বর্গ ও নরক দুটো জায়গার
কী দরকার। একটাই তো যথেষ্ট — স্বর্গ
ব্যর্থ মানুষদের কাছে সেটাই তো হয়ে উঠবে
নরক।

২/
সাগরে তেল তোলার বিরাট বিরাট যন্ত্র। গিরিখাদে
সোনা সন্ধানীদের হাড়গোড় রোদ্দুরে ঝকঝক।
এদের সন্তানেরাই তো বানাল স্বপ্নপুরী হলিউড।
চারটে শহর
ফিল্মের তেলচিটে গন্ধে ভরপুর।

৩/
পরির নামের শহর
আর পরিদের দেখাও পাবে তুমি সারাক্ষণ
গায়ে তেলের গন্ধ, পরনে সোনালী যোনি-বন্ধ
চোখের নীচে নীলচে ভাব —
রোজ সকালে সুইমিং পুলে লেখকদের খাওয়ায় তারা।

৪/
সবুজ মরিচ গাছের নীচে
গানের লোকেরাও লেখকের সঙ্গে
যুগলে যুগলে বেশ্যাসঙ্গ করে। যেন
বাখ লিখছেন 'স্ট্রাম্পেট ভলেন্টারি', আর দান্তে
নাড়াচ্ছেন কামানো পাছু।

৫/
এঞ্জেল অফ লস এঞ্জেলস
হাসির তোড়ে ক্লান্ত। মরিয়া হয়ে
এক সন্ধেতে ফলের দোকানের পিছন থেকে
তারা কেনে ছোট ছোট
যৌন গন্ধে ভরা শিশি।

৬/
চার শহরের মাথার ওপর
পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে প্রতিরক্ষার
বোমারু বিমান।
লোভ আর দারিদ্র্যের কোনও দুর্গন্ধই
যেন না পৌঁছয়।

হলিউড

পেটের চিন্তাতেই আমায় রোজ
যেতে হয় বাজারে।
যেখানে শুধু মিথ্যের কারবার।
আশার কথা
বিক্রেতাদের দলে আমিও ভিড়ে যেতে পারি।

১৯৪১ সাল থেকে প্রায় বছর সাতেক ব্রেখট হলিউডের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। গল্প, চিত্রনাট্য ইত্যাদি হলিউডের জন্যে লিখেছেন তিনি। কিন্তু কখনোই হলিউডকে তাঁর পছন্দসই জায়গা মনে হয়নি।

চণ্ডী মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক।